সেলিম রেজা নিউটন

হিংসা দিয়ে রাষ্ট্র বোঝার মুশকিল

David Larwill 1995 In the Chair

রাষ্ট্র মানেই লেফটরাইট?

সেই মার্কস-বাকুনিনদেরও আগের থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা প্রাথমিক আওয়াজ হলো এই রাষ্ট্র নিপীড়ক, ত্রাসনির্ভর– সুতরাং এই রাষ্ট্র ভেঙে ফেলতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলব কীভাবে? রাষ্ট্র কি চেয়ারটেবিলের মতো ভঙ্গুর পদার্থ? আরও প্রশ্ন এই যে: পুঁজি-প্রতাপ-বলপ্রয়োগনির্ভর এখনকার রাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে কী ধরনের রাষ্ট্রীয়-সামাজিক বিন্যাস গড়ে তুলব আমরা? কীভাবেই বা গড়ে তুলব?

এসব প্রশ্নের উত্তরে জার্মান নৈরাজ্যচিন্তক গুস্তাভ ল্যান্ডাওয়ার বলতেন, রাষ্ট্র তো কোনো দালান নয়; একে তাই গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রকে তিনি ব্যক্তি-মানুষের বা সমাজের বাইরের একটি জিনিস মনে করতেন না। তাঁর চোখে আমরাই রাষ্ট্র; ব্যক্তি-নাগরিকেরাই রাষ্ট্র। রাষ্ট্র আসলে এক প্রকার সম্পর্ক মাত্র। আমাদেরই মধ্যকার বিশেষ এক প্রকার সম্পর্ক। সম্পর্কের এই ধারাকে গোড়া থেকে বদলানো না গেলে রাষ্ট্রকে আমূল বদলানো যাবে না। উইকিলিকস-সম্পাদক জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের অন্যতম ওস্তাদ এই ল্যান্ডাওয়ার বই থেকে তুলে ধরছি:

> একটা টেবিল উল্টে ফেলা যায় কিংবা একটি জানালা ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলা যায়। কিন্তু যাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্রও এমন একটা পদার্থ বা প্রতিমা যাকে উল্টে ফেলা যায় বা ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলা যায়, তাঁরা আসলে কুতার্কিক (সোফিস্ট) এবং শব্দ-উপাসক মাত্র। রাষ্ট্র আসলে একটা সামাজিক সম্পর্ক। রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক স্থাপনের বিশেষ একটা উপায়। একে ধ্বংস করা যেতে পারে নতুন সামাজিক সম্পর্করাশি সৃজন করার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ একে অপরের সাথে ভিন্ন উপায়ে সম্পর্ক-স্থাপন-করা মানুষজনের মধ্য দিয়ে।
>
> চূড়ান্ত রাজতন্ত্র বলেছিল: আমিই রাষ্ট্র। আর, আমরা যাঁরা নিজেদেরকে চূড়ান্ত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কারারুদ্ধ করেছি, সেই আমাদেরকে অবশ্যই এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে: আমরাই রাষ্ট্র! আমরা রাষ্ট্র হিসেবেই থেকে যাব, যতক্ষণ না আমরা আলাদা কিছু হতে পারছি– যতক্ষণ না আমরা এমন ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে পারি যা মানুষের জন্য একটি সত্যিকারের সম্প্রদায় ও একটি সত্যিকারের সমাজ গড়ে তুলবে ('দুর্বল রাষ্ট্রনায়ক, দুর্বলতর জনগণ!' গুস্তাভ ল্যান্ডাওয়া, ১৯১০: ২১৪)। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩: ১৫৯)

আসলে বিদ্যমান রাষ্ট্রকে ভেঙে-গুঁড়িয়ে ফেলা এবং নতুন রাষ্ট্র-সামাজিক বিন্যাস গড়ে তোলার প্রশ্নে সেই উনবিংশ শতক থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের মধ্যে ছিল আলাদা আলাদা মত। মার্কসবাদীরা ভাবতেন, এখনও ভাবেন, বিদ্যমান রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অক্ষুণ্ন তো রাখতে হবেই, সেগুলোরই সাহায্যে প্রতিপক্ষকে দমন করতে হবে, এবং তারই মাধ্যমে নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় ভালোমানুষেরা গেলেই কি পুরোনো জমানার জেলজুলুমের রাষ্ট্র আপনাআপনি একটা মুক্তিমুখর

সামাজিক সংস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে? তাই রাষ্ট্রবিরোধী (অ্যানার্কিস্ট) মুক্তিদিশারীরা ভাবতেন রাষ্ট্র জিনিসটাকেই উড়িয়ে দিতে হবে– একেবারে প্রথম সুযোগেই। রাষ্ট্র নামের কোনো প্রতিষ্ঠান রাখাই যাবে না। কোনোভাবেই না। কেননা ঐ বস্তু থাকলেই গোটা সমাজ একটা কালেক্টিভিস্ট কারাগারে পরিণত হবে– যেমনটা হয়েছিল লেনিন-স্তালিনদের বলশেভিক রাশিয়ার ৭০ বছরে।

একই প্রশ্ন তুলেছিলেন নোম চমস্কি 'গভর্নমেন্ট ইন দ্য ফিউচার' – 'ভবিষত্যের সরকার' – নামের একটি বক্তৃতায়। ১৯৭০ সালে, নিউ ইয়র্কে। ওখানে চমস্কি জানতে চাচ্ছিলেন, রাষ্ট্র মানেই কী আবশ্যিক একটা কালেকটিভিস্ট জেইল? যৌথতাপন্থী জেলখানা হওয়া ছাড়া রাষ্ট্রের কি কোনো গতি নাই? প্রশ্নটা তিনি তুলেছিলেন ফ্রান্সের অরাজতাত্ত্বিক ফার্দান্দ পেলুতিয়েরের বরাতে: 'অল্পস্থায়ী যে রাষ্ট্রটার শরণাপন্ন আমাদেরকে হতে হবে আবশ্যিকভাবে এবং অপরিহার্যভাবে, সেই রাষ্ট্রটাকেও কি অবশ্য-অবশ্যই একটা যৌথতাপন্থী জেলখানাতে পরিণত হয়েই টিকে থাকতে হবে?' এখানে 'যৌথতাপন্থী জেলখানা' বলতে পেলুতিয়ের বুঝিয়েছিলেন 'রাষ্ট্রতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'কে (ড্যানিয়েল গুয়েরিন, ২০০৫: ৬৯০)। পেলুতিয়েরের প্রশ্ন ছিল: যদি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে (মানে বলপ্রয়োগমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে) বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, আর তার পর থেকে রাষ্ট্রকে যদি 'শুধু উৎপাদন-উপভোগ বিষয়ক চাহিদাগুলোর ভেতরেই পুরোপুরিভাবে পরিসীমিত' করে রাখা হয়, তাহলেও কি রাষ্ট্র জিনিসটা 'মুক্তিপরায়ণ একটা সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না?' (ফার্নান্দ পেলুতিয়ের, ১৮৯৫)। 'কোনো-না-কোনোভাবে এই প্রশ্নের একটা ইতিবাচক উত্তর যদি না থাকে' – নোম চমস্কি বলছেন – 'তাহলে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে বাম ধারার মানবিকতাধর্মী আদর্শগুলো অর্জন করার খুব বেশি সুযোগ থাকবে না।' (নোম চমস্কি, ১৯৭০)

বাকুনিনরা যেভাবে ভাবতেন যে, প্রথম সুযোগেই পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দিতে হবে এক ধাক্কায়, সেটা কিন্তু বাস্তবোচিত চিন্তা নয়। আমরা চাই বা না চাই রাষ্ট্র থাকছে। থাকবে। কেননা, যে নামেই ডাকি না কেন, আদতে রাষ্ট্র এমন একটা প্রতিষ্ঠান যা আসলে আমাদের সকলের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই গঠিত। এই জাতীয় একটা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কিন্তু সমাজে থেকেই যায়।

এখন কথা হলো, প্রতিষ্ঠানটার রূপকাঠামো কেমন হবে? কেমনভাবে আমরা

সেটাকে গড়ব, সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের যে-চেহারা আমরা গড়ে তুলেছি গত তিন হাজার বছর ধরে, তার অনেক বড় বড় দাঁত। অনেক বড় বড় নখ ও পেশির শক্তির ওপর এটা প্রতিষ্ঠিত। বলপ্রয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। চমস্কি, পেলুতিয়ের প্রমুখের আলাপ থেকে বোঝা যাচ্ছে: রাষ্ট্র হতে গেলে তাকে নখ-দাঁত-পেশীওয়ালা প্রতিষ্ঠান হতেই হবে এমন কোনো কথা নাই। 'রাষ্ট্র মানে লেফটরাইট' না-হওয়াটাও তাহলে সম্ভব – যদি আমরা চাই।

তার মানে এটাও সম্ভব যে চাইলে আমরা আমাদের এখনকার রাষ্ট্রযন্ত্রটার দাঁত এবং নখগুলো আস্তে-ধীরে ছেঁটে দিতে পারব। তার বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করে দিতে পারব। এটা যদি আমরা করতে না পারি – সমাজ ও রাষ্ট্রের অহিংস-অসামরিক রূপান্তর ঘটাতে যদি আমরা না পারি – তাহলে সমাজের মুক্তিমুখিন পরিবর্তনের জন্য নিবেদিত যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলন ঘুরেফিরে ঐ যৌথতাবাদী জেলখানার ভেতরেই মুখ থুবড়ে পড়বে। বলশেভিক রাশিয়াতে আমরা এটাই ঘটতে দেখেছি। দেখেছি মহাসাগরের মতো বিপুল একটা সামাজিক বিপ্লব কীভাবে সেই জার আমলের দাঁত-নখওয়ালা রাষ্ট্রীয় গাড্ডায় গিয়েই পড়ল।

রাষ্ট্র এবং আইনকানুন-বিধিবিধানের আদি অর্থ

আদিতে 'রাষ্ট্র' বলতে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক ও জবরদস্তিমূলক কোনো সংস্থাকে বোঝাতো না। প্রাচীনতম কালে রাষ্ট্র বরং সর্বসাধারণের সম্মতিতে স্বেচ্ছায় গড়ে ওঠা সমিতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল– এরকমটা ধরে নেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'রাষ্ট্র' শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাসের মধ্যে। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'রাষ্ট্র' অহিংস এবং অসামরিক। আমার *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য* বইতে আমি দেখিয়েছি:

> 'নৈরাজ্য', 'রাজ', 'বিরাজ', 'রাজ্য', 'রাজা', 'রাজন', 'সম্রাট', 'রাষ্ট্র' প্রভৃতি শব্দের আদিতে আছে 'রাজ্' নামের ধাতুটি (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭)। এই 'রাজ্'-এর অর্থ হচ্ছে, "শোভা, দীপ্তি" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭)। এ থেকে উৎপত্তি লাভ করা 'রাজ' শব্দটির অর্থ, "শোভা পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া"; "প্রকাশ পাওয়া, বিদ্যমান থাকা" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭)। এইভাবে, 'বিরাজ' শব্দের অর্থ "শোভমান, শোভিত", "দীপ্যমান, দীপ্ত"; কিংবা "শোভা পাওয়া, শোভিত

> হওয়া"; "শোভা করিয়া অবস্থান করা", "বিদ্যমান থাকা, উপস্থিত থাকা" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৫৬৭)। আবার, 'সম্রাট' শব্দের একটা অর্থ 'রাজা' তো বটেই, এর বুৎপত্তিগত গোড়ায় আছে "সম্ + √ রাজ + কিপ", অর্থাৎ "যিনি মণ্ডলেশ্বর ও রাজগণের শাসক, তিনি সম্রাট" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ২১৫৮)। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে: যিনি শোভা পান, যিনি দিপ্তী পান, যিনি প্রকাশ পান, যিনি বিদ্যমান থাকেন, তিনিই হন রাজা। এক কথায়, 'রাজা' মানে "যিনি দীপ্তি পান" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭)।
>
> তাহলে, 'রাজা' ছাড়া বাকি সব মানুষ কি শোভা পান না, দিপ্তী পান না, প্রকাশ পান না, বিদ্যমান থাকেন না? নিশ্চয়ই পান, নিশ্চয়ই থাকেন। কিন্তু 'রাজা' ছাড়া অন্যসব লোকের – আমজনতার – শোভা, দিপ্তী, প্রকাশ, বিদ্যমানতা প্রভৃতির 'আইনত' কোনো মূল্য নাই। বলা রীতিমতো বাহুল্য, আইন মানে এখানে (এবং এখনও পর্যন্ত সর্বত্রই) রাজার আইন, [রাজতন্ত্রী] রাষ্ট্রের আইন। 'রাজা' ছাড়া অন্যসব ব্যক্তিও যদি শোভা পান, দিপ্তী পান, প্রকাশিত হন, বিদ্যমান থাকেন, তাহলে আর 'রাজা'র সাথে সবার পার্থক্য কী থাকে? এই তো সেই কারণ, যে জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "আমরা সবাই রাজা"র একটা সমতা-সহযোগিতা-স্বাধীনতাভিত্তিক সমাজের কল্পনা করতে পেরেছিলেন। সত্যিই তো, 'রাজা'ই যদি বলতে হয়, তাহলে তো আমরা সকলেই রাজা, কেননা আমাদের সকলেরই নিজ নিজ ধরনের শোভা, দিপ্তী, প্রকাশ এবং বিদ্যমানতা, বিরাজমানতা আছে …
>
> 'রাষ্ট্র' শব্দের উৎপত্তিও ঐ একই জায়গা থেকে – 'রাজ্' (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯১৮)। 'রাষ্ট্র' শব্দটির গোড়ায় আছে: " √ রাজ্ + ত্র (ষ্ট্রন্)", যার অর্থ "রাজ্য" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯১৮)। বোঝা যায়, … বিদ্যমানতা বা বিরাজ করার [যে] গাঠনিক কাঠামো, তারই নাম 'রাষ্ট্র'। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩: ১৩৫–১৩৬)

'রাষ্ট্র' শব্দের এই সব অর্থের মধ্যে কোনো প্রকার হিংসা, জবরদস্তি, সামরিকতা ইত্যাদির লেশমাত্র দেখা যাচ্ছে না। বরং সাধারণ ব্যক্তিবর্গের বিরাজমান থাকতে পারার ও বিকশিত হয়ে উঠতে পারার সাধারণ একটি সম্ভাবনাকে কীভাবে পরবর্তী কালে গুটিকয় মানুষ অস্ত্র-শস্ত্র-শাস্ত্রের নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার হিসেবে সংকীর্ণ করে তুলেছে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এসব অর্থের মধ্যে। যেকোনো প্রকার শোভা, দিপ্তী, প্রকাশ, বিদ্যমানতা, ও

বিরাজমানতার যে সামাজিক আয়োজন, তারই নাম রাষ্ট্র। এ যদি একক-অদ্বিতীয় ব্যক্তিমাত্রের হয়, তবে তা হয় ব্যক্তি-রাষ্ট্র (ওরফে রাজতন্ত্র) ওরফে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র; আর এ যদি হয় সর্বসাধারণের শোভা, দিপ্তী, প্রকাশ, বিদ্যমানতা, ও বিরাজমানতার সামাজিক আয়োজন, তবে তা হয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। স্বৈরতন্ত্রী ব্যক্তি-রাষ্ট্রের দাঁত-নখই প্রধান, সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় দাঁতনখবর্জিত।

উপরন্তু, রাষ্ট্রের আরও একটা অর্থ "প্রচার, প্রকাশ" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯১৮)। কোনোকিছুর "বিরাজত্ব যখন প্রচারিত হয়, প্রকাশিত হয়, এবং সবাই সে ব্যাপারে সম্মত হয় তখনই 'রাষ্ট্র' উৎপত্তি লাভ করে, গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যায়" (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩: ১৩৬)। জনমনে রাষ্ট্রের এই অর্থটাই এই সেদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। উচ্চারণ-সরলতার গুণে 'রাষ্ট্র' শব্দটা 'রাষ্ট' হলেও অর্থ ঐ একই থাকে: 'দেশব্যপ্ত, প্রকাশ, বিদিত' (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯১৮)।

আবার, ইংরেজিতে 'রাষ্ট্র' শব্দটা 'স্টেট'। 'স্টেট' একটি অবস্থা। আগে থেকেই বিরাজমান একটা অবস্থা– এ গিভেন কন্ডিশন। এমন একটি কন্ডিশন – বোঝাই যাচ্ছে – যে-কন্ডিশনের ব্যাপারে সবাই সর্বসম্মত আছেন, জেনারেল এগ্রিমেন্ট আছে। তো সেই ধরনের একটা অবস্থার নাম মানুষ দিয়েছিল 'স্টেট'– আদিতে।

রাষ্ট্র মানে তাহলে পারস্পরিক প্রচার, অবাধ কথাবলাবলি, এবং অবাধ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এগ্রিমেন্ট – রাষ্ট্র মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যে জিনিসটা গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যায়, সেটাই সবার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সেটাই রাষ্ট্র। বাস্তবে যেহেতু রাজা একা বিরাজ করেন না, জগতে যেহেতু পূর্ণমর্যাদা সহকারে সকলেই বিরাজ করেন, সুতরাং আজকের রাষ্ট্রকে হতে হবে রবীন্দ্রনাথের 'আমরা সবাই রাজা'র রাষ্ট্র। সকলেরই আত্মপ্রকাশের, আত্মবিকাশের এবং নির্ভয়ে বিরাজ করতে পারার মতো রাষ্ট্র যেটা নয় সেটা সকলের রাষ্ট্র নয়; সেটা শুধু এক-রাজার রাষ্ট্র; সেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। আমাদের কর্তব্য তাহলে ভয়ভীতি-বিভীষিকার ঊর্ধে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিগঠনের কর্তব্য।

এই কয় দিন আগে আমাদের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের 'ম্যাজিক লণ্ঠন কথামালা'র অতিথিবক্তা শ্রদ্ধাভাজন চলচ্চিত্র-পরিচালক জনাব আবু সাইয়িদের আলোচনার সূত্র ধরে বলা আমার কিছু কথাকে পরে লিখিত রূপ দিতে গিয়ে দেখলাম, 'আইন', 'কানুন', 'ল' ইত্যাদি শব্দের এটিমোলোজির

ভেতরেও আছে বলপ্রয়োগহীন এগ্রিমেন্ট ও আন্ডারস্ট্যান্ডিঙের ধারণা। আদিতে এই শব্দগুলোর মধ্যে বলপ্রয়োগের কোনো আইডিয়াই নেই। বলপ্রয়োগের আইডিয়া এসেছে পরে, যখন নাকি সমাজের সেন্ট্রালাইজড অথরিটি আমাদেরকে সম্যকভাবে শিখিয়ে দিতে পেরেছেন যে, বলপ্রয়োগের জায়গাটাই হতে পারে বোঝাপড়ার একমাত্র ভিত্তি– যেন বলপ্রয়োগ ছাড়া মানুষে-মানুষে মতৈক্য সম্ভব না। আর এভাবে 'আইন', 'কানুন', 'ল' প্রভৃতি শব্দগুলোর আদি অর্থও বদলে গেছে, বেহাত হয়ে গেছে। 'কর্তৃত্বতন্ত্র শিল্পবোধ স্বাধীনতা' নামে আমার সেই রচনা থেকে দীর্ঘ হলেও একটু উদ্ধৃতি এখানে দিতে হচ্ছে:

> আদিতে কিন্তু কোনো প্রকার বলপ্রয়োগই সনাতন-আবহমান নিয়ম-নীতি-আইন-কানুনের ভিত্তি ছিল না। আইন বলতে আজকে আমরা বুঝি লিখিত আইন। লিখিত আইন নিতান্তই অর্বাচীন। অল্পদিনের। চিরকালীন সুপ্রাচীন পৃথিবী চলেছে চিরকালই চলেছে অলিখিত আইনের ভিত্তিতে। প্রচলিত সামাজিক বিধিব্যবস্থা, নিয়মকানুন, রীতিনীতি, যার যার সম্প্রদায়ের প্রথা-বিশ্বাস-ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার-অভ্যাস, রেওয়াজ-দস্তুর-চল, ও সংস্কার-ধর্মাচার ইত্যাদিই ছিল মানুষে-মানুষে লেনদেনের, মিলেমিশে থাকার অলিখিত ভিত্তি। ব্যক্তি ও সমাজকে টিকিয়ে রাখার এবং নিরাপদে ক্রমবিকশিত করে তোলার প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল এইসব অলিখিত আইন। অযুত-নিযুত বছর ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল এইসব অলিখিত সামাজিক নিয়ম-কানুন-বন্দোবস্ত। এগুলোর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনের জন্য কোনো কেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষ ছিল না মোটেও। আর পিতৃতন্ত্রের উৎপত্তিরও অনেক আগেই এইসব জিনিসের সর্ব-সামগ্রিক একটা সিস্টেম গড়ে উঠেছিল। এখনও দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক মানুষের নানা ধরনের আদিবাসী সমাজ চলে এইসব অলিখিত সামাজিক আইনে। এমনকি আমাদের অক্ষর-সভ্য দুনিয়ার মানবসমাজেও এইসব সুপ্রাচীন নিয়মকানুনের সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নানা রকমের আচার-অভ্যাস ও উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে।
> ...
>
> ... বাংলায় 'নিয়ম-কানুন-বিধি-বিধান' কথাগুলো লক্ষ করলেও আমরা এই ধারণার সত্যতা সম্পর্কে ধারণা পাব। এ শব্দগুলোকে আজকের অর্বাচীন রাষ্ট্র-নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় আইনের ধারণার আলোয় বুঝে থাকেন। তারা ভাবেন এগুলো রাষ্ট্র-লিখিত 'আইন'-এর প্রতিশব্দ মাত্র। আসলে তা নয়। 'নিয়ম', 'কানুন', 'বিধি' ও 'বিধান' এর সাথে – আদিতে – রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষীয় লিখিত আইনের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এইসব শব্দের মধ্যে আছে আদিতম বিকেন্দ্রায়িত ও স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক বন্দোবস্তের ইশারা। ...

বঙ্গীয় শব্দকোষ থেকে আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে যে 'নিয়ম' জিনিসটার গোড়ায় আছে সংযম, সংকল্প, অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার ধারণা। তার মানে নিজেকে নিজে সামলানোর ধারণা। আরো আছে ব্রতচর্যা, নিত্যকর্ম, মন্ত্রণা, ও ব্যবস্থার ধারণা। বেদান্তসার অনুসারে: নিয়ম হচ্ছে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর-প্রণিধান। *মার্কণ্ডেয় পুরাণ* মতে: নিয়ম হলো অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহারলাঘব, ও স্বাধ্যায়। অত্রি সংহিতা বলছে: নিয়ম হচ্ছে তপঃ, দান, ব্রত, শৌচ, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, উপস্থনিগ্রহ, মৌন, উপবাস, আর স্নান। *যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা* মোতাবেক নিয়ম হলো শৌচাদি, সপ্ত গুরুসেবা, অক্রোধ, ও অপ্রমাদ। সর্বোপরি, *মীমাংসা-শাস্ত্র* সুস্পষ্ট করে জানাচ্ছে: নিয়ম হলো 'যাহা জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিপ্রাপ্ত ... তাদৃশ বিধি বিশেষ'। (দ্রষ্টব্য: হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক: ১২১২)

এখানে অক্রোধ, আহারলাঘব, ব্রত, মৌন, উপবাস, উপস্থনিগ্রহ (কাম-ইন্দ্রিয় সংযম) ইত্যাদি থেকে সংযম, স্বনিয়ন্ত্রণ আর স্বপরিচালনার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিয়ম তাহলে নিজেকে নিজে বা নিজেদেরকে নিজেরা চালানো। আবার, নিত্যকর্ম, শৌচাদি, তপস্যা, দান, গুরুসেবা ইত্যাদি বলছে প্রচলিত রীতি মোতাবেক চলা এবং সৎকর্ম ও শুভকাজ সাধন করাই নিয়ম। অন্য দিকে, বিশেষ করে অপ্রমাদ থেকে বোঝা যায়: ভুল না করা বা সঠিক পথে নিজেকে চালানোই নিয়ম। আর *মীমাংসা* যা বলল, জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সাথে মানানসই বিধি-বিধানই নিয়ম। এর সাথে আজকের রাষ্ট্রের লিখিত আইনের সম্পর্ক কোথায়?

এবার আসি নিয়মকানুনের কানুনে। 'কানুন' শব্দটা আমাদের এখানে এসেছে আরবি শব্দ 'কানূন' [قانون] থেকে (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক: ৫৯৮)। এর আদি উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'কানা' [κάννα] থেকে। অনলাইন 'উইকশানারি' অভিধান অনুসারে, 'কানা' শব্দটার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটা অর্থ হলো 'নিয়ম, প্রথা, ও সাধারণ নীতির সাহায্যে কোনো কিছুকে বিচার করে দেখা' [something to judge by rule, norm, general principle (https://en.wiktionary.org/wiki/κανών)]। 'নিয়ম' এখানে ইংরেজি 'রুল' নামের যে কথাটা আছে তা নিয়ে একটু পরে আসছি। আপাতত, তার আগে 'বিধিবিধান'-এর অর্থ তালাশ করা যাক।

বঙ্গীয় শব্দকোষে 'বিধি' কথাটার অর্থ 'করণ' 'সম্পাদন' 'প্রবর্ত্তন' 'অনুষ্ঠান' 'সৎকার' 'প্রয়োগ' 'স্রষ্টা' 'কাল' 'সময়' 'দৈব' 'নিয়তি'

'অদৃষ্ট' 'উপায়' 'সংস্কার' ইত্যাদি (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ: ১৫৪৪)। অন্য দিকে, 'বিধান' কথাটার অর্থ 'বিধি'র মতোই। 'করণ' 'অনুষ্ঠান' 'নির্ম্মাণ' 'সাধন' 'সম্পাদন' 'উপায়' 'কর্ম্ম' 'বিহিত' 'সংস্কার' 'নিত্যকর্ম্ম' ইত্যাদি (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ: ১৫৪৪)। বিধিবিধানের এইসব আদি অর্থের মধ্যে কতিপয়ের লেখা বা সংকলিত করা কোনো আইনের ধারণার লেশ মাত্র যে নাই, তা শাদা চোখেই দেখা যায়। কর্তৃত্বতন্ত্রের উৎপত্তির পরে শাস্ত্র এবং শাস্ত্রবিধি জাতীয় ধারণার উৎপত্তি ঘটে। মনে করিয়ে দিয়ে রাখি, 'মহাভারত' মোতাবেক আদিতম শাস্ত্রবিধির নাম হলো দণ্ডবিধি এবং এর উদ্ভব বহু পরের ঘটনা। (আদিতম সমাজে রাজা, দণ্ডবিধি, ও কর্তৃত্বতন্ত্রের আদি উৎপত্তি নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫-ঘ)।

আইন ব্যাপারটা আদিতে যে বহুকালব্যাপী প্রচলিত সামাজিক সংস্কার-রীতিনীতি-বিধিবিধান ও প্রথাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, তা এমনকি ইংরেজি ভাষার 'রুল' এবং 'ল' শব্দগুলোর দিকে তাকালেও বোঝা যায়। [... ইংরেজি শব্দগুলোর অর্থ অনলাইন বহুভাষিক অভিধান 'উইকশানারি' থেকে নেওয়া হয়েছে (en.wiktionary.org)]। ইংরেজি rule শব্দের অর্থ 'স্বাভাবিক অবস্থা বা সার্বিক পরিস্থিতি' [A normal condition or state of affairs (https://en.wiktionary.org/wiki/rule)]। এর আরো একটা অর্থ হচ্ছে: 'সর্বজনীন বা সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে, বা প্রচলিত আচার-অনুশীলনের ভিত্তিতে [কোনো কিছু] নির্ধারণ করা' [to fix by universal or general consent, or by common practice (https://en.wiktionary.org/wiki/rule)]। উইকশানারি বলছে, অধিকতর সর্বজনীন অর্থের দিক থেকে 'ল জিনিসটা সাধারণত প্রচলিত রীতিনীতি-ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট' [Laws are usually associated with mores (https://en.wiktionary.org/wiki/law)]। প্রচলিত রীতিনীতি-ঐতিহ্য বলতে ইংরেজিতে যাকে বলে 'মোর্স' আর কি। ... 'মোর্স' কথাটার মানে হলো 'নীতি-নৈতিকতাগত এমন এক গুচ্ছ প্রথা বা প্রচলিত যার উৎপত্তি ঘটে সাধারণ-ভাবে স্বীকৃত আচার-অনুশীলন থেকে – লিখিত আইন থেকে নয়' [A set of moral norms or customs derived from generally accepted practices rather than written laws (https://en.wiktionary.org/wiki/ mores)]। ...

... সনাতন কাল থেকে আচরিত, অনুসৃত ও অনুশীলিত সামাজিক নিয়ম-কানুন-বিধি-বিধান-আইনের সাধারণ পাটাতন ছিল পারস্পরিক

> শ্রদ্ধা-বোধ, শলাপরামর্শ ও সমঝোতা, প্রচলিত আচার-অনুশীলন ও রীতিনীতি, এবং সমাজ-সংহতির অনুভূতি। বঙ্গীয় শব্দকোষে যেমনটা দেখলাম, নিয়ম জিনিসটার একটা অর্থ যে 'মন্ত্রণা', তা থেকেও কিন্তু এই ধারণাই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি, দণ্ডবিধি, বা কর্তা-কর্তৃপক্ষের কোনো কারবারই নাই। মানুষ নিজের গরজেই নিয়ম মতো জীবনযাপন করে এসেছে। এখানে সর্বসাধারণের ওপর গুটিকয়ের মাতব্বরি-পোদ্দারির কোনো কাহিনী নাই। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫-ক)।

একইভাবে এই রকম আরও দুই একটা শব্দের হদিস নেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরা যাক,

> 'সভা'র আদি এবং বুৎপত্তিগত অর্থ হলো: যেখানে সবাই সমভাবে 'ভাত' বা 'প্রতিভাত' তথা 'আলোকিত' থাকেন। কেউ আলাদা কোনো সিংহাসন-চেয়ারে বসেন না। কোনো কর্তা-কর্তৃপক্ষ অন্যের ওপর ছড়ি ঘোরান না। আজকের মতো সভার লাইমলাইট শুধু বিশেষ হুজুরদের ওপর ফোকাস করা হয় না। 'সমিতি' কথাটার বুৎপত্তিগত অর্থ হলো: 'সহ (সমান) মিত যাহার'; 'সমপরিমাণ' (অর্থাৎ সমমাপের)। সমিতি তাহলে এমন প্রতিষ্ঠান যেখানে সকলের পরিমিতি বা মূল্য সমজাতীয়। অন্য দিকে 'সঙ্ঘ' প্রসঙ্গে বুদ্ধসঙ্ঘের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে গুরুশিষ্যের সমঅধিকার ছিল, সমান ভোটের ব্যবস্থা ছিল। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের 'সংঘ ও নিয়তি' প্রবন্ধটি। সাথে বলে রাখি বাংলায় 'আড্ডা' শব্দটার মূল অর্থ: 'সমবেত হওয়া; একসঙ্গে মেলা'; 'কার্য্যবিশেষের নিমিত্ত তৎসংক্রান্ত লোকদিগের সম্মিলনস্থান'। (শব্দার্থগুলোর জন্য হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক এবং হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ দ্রষ্টব্য।) (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫-খ)

তো, এইভাবে রাষ্ট্রকে তো বটেই, তা ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বুনিয়াদি সংস্থা ও ধারণা যেমন সভা, সমিতি, সঙ্ঘ, আড্ডা, আইনকানুন, নিয়ম, বিধি ইত্যাদিকেও সেসবের আদি উৎপত্তিগত সাধারণ উপলব্ধির আলোকে যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি, তাহলে বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারব।

গুম-খুন-ক্রসফায়ারের রাষ্ট্রীয় ডিসকোর্স বদলের কর্তব্য এবং হিংসা দিয়ে রাষ্ট্র বোঝার মুশকিল

আজকের এই দাঁত-নখওয়ালা যে রাক্ষস-রাষ্ট্র এটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারব এই বলে যে: রাষ্ট্র আদিতে এই জিনিস ছিল না আদৌ। রাষ্ট্র আদতে ছিল অবাধ ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সর্বজনীন একটা প্রতিষ্ঠান। আদিতে এর ভেতরে আছে সার্বিক বোঝাপড়া ও স্বপরিচালনার ধারণা। সুতরাং আজকে আমাদেরকে এমন একটা রাষ্ট্র-রূপ রচনা করতে হবে যেখানে সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে, যেখানে সর্বসাধারণের ওপর গুটিকয়-কতিপয় লোকের মাতব্বরির বন্দোবস্ত থাকবে না। আদি অভিধান-পুরান-সংকলনগুলো এই ইশারাই দিচ্ছে যে মনুষ্য নিজেরা নিজেদেরকে পরিচালনা করতে সক্ষম।

আধুনিক পরিসরে রাষ্ট্রকে তার আদি উজ্জ্বল অহিংস মহিমায় উদ্ভাসিত করে তোলার চিন্তা করাটা তাহলে সম্ভব। রাষ্ট্রের দাঁত-নখগুলোকে ক্রমাগতভাবে ছেঁটে ফেলার আওয়াজ তোলা সম্ভব। এবং সেই আওয়াজ তোলার জন্য প্রথম আওয়াজ হচ্ছে যে 'নো মোর র‍্যাব'। দুই হলো: পুলিশ এবং সেনাবাহিনী যেগুলো আছে সেগুলোকেও বলপ্রয়োগমূলক বন্দুকধারী বাহিনী থেকে ক্রমশ বন্দুকহীন, সেবামূলক, উচ্চমর্যাদাশালী ও সুসংগঠিত সামাজিক সংস্থায় রূপান্তরিত করার আলাপটা সমাজে পেশ করতে শুরু করা। দরকার এই আলাপ তোলা যে, বাংলাদেশ-রাষ্ট্রকে একটা সেনাবাহিনীবিহীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার দিকে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। আমাদের আসলে প্রচলিত আর্মি প্রয়োজন নেই। ভারতের সাথে মারামারি করে কূল করতে পারব না। আর এ কথা কে না জানেন যে, সারা পৃথিবীতে আর্মিগুলোর এক নম্বর কাজই হলো নিজের জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রাখা, ভয়ভীতি-বিভীষিকার মাধ্যমে তাঁদেরকে ক্ষুদ্র একটি এলিট শ্রেণীর একচ্ছত্র শাসনের বশীভূত রাখা। এটাই তার অস্তিত্বের আসল কারণ। বলা দরকার যে, বাংলাদেশকে ক্রমশ একটি বেসামরিক ও কল্যাণকর রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার কথা তোলা সম্ভব (দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১; সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫-গ)।

রাষ্ট্রের অহিংস-অসামরিক রূপান্তরের ঐতিহাসিক কর্তব্যকে মাথায় রেখে কী করতে পারি আমরা? দেখতেই পাচ্ছি, আমরা পারি রাষ্ট্র-আইন-জেলজুলুম-গুম-খুন-ক্রসফায়ার বিষয়ক বিদ্যমান কথকতা-কমনসেন্সটাকে পাল্টে দেওয়ার

উদ্যোগ নিতে। কিন্তু রাষ্ট্র এবং তার আইনকানুনকে স্রেফ ভায়োলেন্স-বিভীষিকা দিয়ে বিশ্লেষণ করার দিকে ঝুঁকে পড়লে রাষ্ট্রের অহিংস-অসামরিক পুনর্গঠনের খোদ ধারণাটাই আকাশকুসুমের উচ্চতায় আরোহন করে বসে। রাষ্ট্রকে স্রেফ ভায়োলেন্স মনে করলে একটা মহাসত্য আড়ালে চলে যায়। সেটা হলো, রাষ্ট্র শুধু বিভীষিকার শক্তিতে চলে না, রাষ্ট্র চলে আসলে জনসম্মতির জোরে। কারণ, খোদ বলপ্রয়োগকেও বৈধতা অর্জন করতে হয় জনসম্মতি দিয়েই।

প্রাচীনতম মানব-ইতিহাসের কথাসূত্র ধরে এগুতে পারলে আমরা টের পাব রাষ্ট্রের আদিতম স্বভাব আসলে সহিংসতা নয়, অহিংস আন্ডারস্ট্যান্ডিং। রাষ্ট্র যদি আদিতে বিভীষিকা-পন্থা হয়ে থাকে তাহলে তাকে মোকাবেলারও একটাই পন্থা – সেটা সেই বিভীষিকা-পন্থা। শুধু মার্কসবাদই নয়, বাম-ডান নির্বিশেষে সর্বপ্রকার কর্তৃত্বমূলক মতবাদই তাই বিভীষিকা-পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেই জন্যই– লেনিনের বলশেভিক সমাজতন্ত্রও শেষ পর্যন্ত যূথবদ্ধ জেলখানায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু আসলে জনসম্মতির ভিত্তিতেই চলে, তাই তার অহিংস-অসামরিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যকে বাস্তব কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে সম্ভাব্য নতুন জনসম্মতিরই জোরে।

বন্ধু বখতিয়ার আহমেদ তার আলোচনায় (বখতিয়ার আহমেদ, ২০১৪) ডিসকোর্স বদলানোর যে-কর্তব্যের কথা তুলেছেন, আমার এতক্ষণকার রাষ্ট্রবিচার সেই কর্তব্যেরই উপযুক্ত তাত্ত্বিক পাটাতন মাত্র। এই পাটাতনটিকে বাদ দিলে ডিসকোর্স বদলের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকরিতার যুক্তি-প্রণালী বোঝা যায় না। কেননা রাষ্ট্র যদি আদতে হিংসারই রাজত্ব হয়, সহিংসতাই যদি তার আদিতম স্বভাব হয়, তাহলে কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনা-ডিসকোর্স দিয়েই ঐ সশস্ত্র হিংসাকে (অর্থাৎ বর্তমান রাষ্ট্রকে) আমূল বদলে ফেলার আশা করা চলে না, তাই না? হিংসা দিয়ে রাষ্ট্র বোঝার এটাও একটা সীমাবদ্ধতা এই যে তাতে করে ক্ষমতা-ডিসকোর্স সম্পর্কটা ঠিকমতো অনুধাবন করা যায় না। ক্ষমতা – রাষ্ট্রক্ষমতা – যেমন সমাজে বিদ্যমান সার্বিক ডিসকোর্সকে নিজের আদলে গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে, পাল্টা-ডিসকোর্সও তেমনি ক্ষমতাকে বদলে দেওয়ার বাস্তব শর্ত-পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। এখানেই পাল্টা-ডিসকোর্স গড়ে তোলার কর্তব্য-প্রচেষ্টার গুরুত্ব। হিংসা দিয়ে রাষ্ট্রকে, ক্ষমতাকে, রাষ্ট্রক্ষমতাকে বুঝতে গেলে এই গুরুত্ব ম্লান হয়ে পড়ে।

কথকতা বদলানোর প্রশ্নটা আদৌ যে জরুরি সেটা এই জন্য যে, রাষ্ট্র চলে যে-বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে সেই বলপ্রয়োগ বৈধতা পায় প্রায় নিরঙ্কুশ জনসম্মতিরই

ভিত্তিতে। খাজনা আদায় করা এবং মারধর করা – এই দুটোই যে রাষ্ট্রের প্রাথমিকতম দুই কাজ সেই মর্মে আমাদের সকলের সর্বসম্মতি আছে। এই দিকটা আমরা মিস করে যাই বারবার। দুটো জিনিস লাগে তাহলে রাষ্ট্রের– একটা হচ্ছে বন্দুক-বলপ্রয়োগ; আরেকটা হচ্ছে বন্দুককে বৈধ প্রতিপন্ন করার জন্য শাস্ত্র। জনসাধারণ যদি সর্বসম্মতভাবে মেনে না নেন যে আমাদের তরফ থেকে গুটিকয় লোক আমাদেরই নামে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র বন্দুক দিয়ে, সেনাবাহিনী দিয়ে রাষ্ট্র চালানো যায় না। বলপ্রয়োগের জন্য বৈধতা লাগে। এই বৈধতাই হলো ঐ ডিসকোর্স। কথকতা। কমনসেন্স।

এখনকার দুনিয়ায় প্রচলিত, প্রায়-প্রশ্নাতীত, এই কমনসেন্স-কাণ্ডজ্ঞান মোতাবেক আমরা সবাই জানি যে ন্যায়বিচার মানেই যে-লোকটা কাউকে খুন করেছেন, আমরাও তাঁকে খুন করব। আমরা সবাই একমত যে লোকটা খুন করেছে তাকে যদি ঠিকঠাক চিহ্নিত করা যায় তাকে মেরে ফেলতে হবে। এটারই নাম হচ্ছে ন্যায়বিচার। তাহলে খুন করাটা অপরাধ না! কে খুন করেছে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। খুনটা যদি রাষ্ট্র করে সেটা অপরাধ না। খুনটা যদি ব্যক্তি করে সেটা অপরাধ। আইনের শাসনের মূল সংকটই এখানে। খোদ খুন করাটাকে যদি আমি খারাপ কাজ বলি তাহলে যে খুন করেছে তাকে আমি পাল্টা খুন তো করতে পারি না! যদি করি তাহলে আমি ঐ খারাপ কাজটাই তো করলাম! মোটকথা হলো, আমাদের এই সংক্রান্ত পড়াশোনা, লেখালিখি, বলাবলি, আলাপ-আলোচনা, বাতচিৎ, কথাবার্তা বাকধারা তথা ডিসকোর্সটাকেই বদলে দিতে হবে। খুন যদি খারাপ কাজ হয় তাহলে রাষ্ট্র খুন করতে পারবে না।

এই জায়গাগুলোতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারলে আমরা গুম-খুন-ক্রসফায়ারের ডিসকোর্স পাল্টে দেওয়ার কাজ এগিয়ে নিতে করতে পারব। এই পথেই বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোকে একদিন আমরা যৌথতাপন্থী জেলখানার পাপচক্র থেকে বের করে আনতে পারব।

পশ্চিমপাড়া, রাবি: ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৪

বইপত্রের হদিস

গুস্তাভ ল্যান্ডাওয়া, ১৯১০। Gustav Landaur, "Schwache Stattsmanner, Schwacheres Volk!", *Der Sozialist*, June; included in his 2010 book Revolution and Other Writings: A Political Reader; Edited and translated by Gabriel Kuhn; Oakland, CA: PM Press.

ড্যানিয়েল গুয়েরিন, ২০০৫। Daniel Guerin, *No Gods, No Masters* [Complete unabridged edition: this edition consists of the first complete English translation of the four volume French edition (original French title, English translation: *Neither God Nor Master*) published in 1980 by Franyois Maspero], Translated by Paul Sharkey; Oakland, CA: AK Press.

নোম চমস্কি, ১৯৭০। Noam Chomsky, "Government in the Future", Talk given at the Poetry Center, New York City, 16th February 1970, Audio file: http://www.chomsky.info/audionvideo/19700 216.mp3, Transcript: http://tangibleinfo.blogspot.com/2006/11/noam-chomsky-lecture-from-1970-full.html (সেলিম রেজা নিউটন কর্তৃক প্রণীত বাংলা অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য: নোম চমস্কি, 'ভবিষ্যতের সরকার', *মাওরুম*, সংখ্যা ১৫, বর্ষ ৬, মে ২০০৯, ঢাকা: হিল রিসার্চ অ্যান্ড প্রোটেকশন ফোরাম। অনলাইন: salimrezanewton.info/article/19/নোম-চমস্কি:-ভবিষ্যতের-সরকার।)

ফার্নান্দ পেলুতিয়ের, ১৮৯৫। Fernand Pelloutier, "Anarchism and the Workers' Union", written on 20 October 1895, printed in *Les Temps nouveaux*, 2–8 November 1895, pp. 409–415 in Daniel Guerin, 2005: 409–415.

বখতিয়ার আহমদ, ২০১৪। 'গুম-খুন-আতঙ্ক: শাসনপ্রণালী ও হত্যার কথকতা', *মঙ্গলধ্বনি*, ২১শে আগস্ট ২০১৪ (mongoldhoni.net/disappearance-murder-panic-tell-of-a-system/) (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবনের নৃবিজ্ঞান-গ্যালারিতে মুক্তধারা নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত 'মুক্তধারা খোলা আলাপ: ৭'-এ উপস্থাপিত মৌখিক আলোচনার পরিমার্জিত লিখিত পাঠ), বাধন অধিকারী কর্তৃক সম্পাদিত *বাংলাদেশ পরিস্থিতি: নয়া উদারবাদী যুগে শাসনপ্রনালী ও কথকতা* গ্রন্থে প্রকাশিতব্য।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১। 'বাংলাদেশকে বেসামরিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই', বিশেষ সাক্ষাৎকার, *সাপ্তাহিক*, অক্টোবর-নভেম্বর, ঢাকা।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩। *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য: এম এন রায়ের মুক্তপরায়নতা প্রসঙ্গে*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫-ক। 'কর্তৃত্বতন্ত্র শিল্পবোধ স্বাধীনতা', *অচেনা দাগ: সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন* । ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫-খ। 'সংগঠন বন্ধুত্ব বিপ্লব: এ রেভোলিউশন টু লিভ!', *অচেনা দাগ: সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন* । ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫-গ। 'সমাজের বেসামরিক রূপান্তরের কর্তব্য', *অচেনা দাগ: সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন* । ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৫-ঘ। 'রাজা এবং রাষ্ট্রের ধর্ম: দণ্ডনীতির উৎপত্তির গল্প', *অচেনা দাগ: সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন* । ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।